ইনকাম অ্যান্ড মাইন্ডসেট

...বদলে দেবে জীবিকার দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা সালেহ আজাদী

সত্যায়ন
প্রকাশন

সূচিপত্র

জীবিকার তালাশে ৬

উপার্জনের মাইন্ডসেট ১২

লাগাম-টানা ৩৫

বেকারত্বের সাতকাহন ৫৫

হালাল-হারাম ৫৯

কোটিপতি ৭৭

পুঁজি ৮৫

ইনকাম ম্যানেজমেন্ট ১০৮

কোনটা রেখে কোনটা ধরি! ১১৩

জীবন-বিমা ১২০

ঋণের ফাঁদ ১৩০

কাফিরদের এত টাকা কেন? ১৩৬

দুনিয়া-বিমুখতা ১৪২

সময় ১৫৯

হিসেবের কাঠগড়ায় ১৬৬

দুনিয়া-বিমুখতা

আমার এক বন্ধুর বাবার গল্প দিয়েই শুরু করি। পুরান-ঢাকার নামকরা কাপড় ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক তাবলীগ করেন। সে-বার বেশ অনেকদিন পর বন্ধুদের বাসায় যাওয়া। তো বাসায় ঢুকে আমার তো পিলে চমকানো অবস্থা! আসবাবপত্র কিচ্ছু নেই। ঘটিবাটি-খাট-টেবিল-আলমিরা—সব হাওয়া। অথচ একসময় কত কিছু ছিল ঘরে। সেসব আজ গেল কোথায়?

ঘটনার রহস্য জানতে পেলাম আরও কিছুক্ষণ পরে। বন্ধুর বাবা নিজেই সবটা খুলে বললেন। এক আমীর সাহেব তাকে বুঝিয়েছেন—এসব ব্যবসা-ট্যাবসা করে কী হবে ভাই! পঞ্চাশটা বছর ধরে তো সংসারই করলে। এবার একটু আখিরাতের পুঁজিপাট্টা কামাই করো। দ্বীনের পেছনে মেহনত করো।

আমীর সাহেবের পরামর্শ তার ভালো লেগে যায়। তক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন—বাকি জীবনটা দাওয়াতি মেহনতে কাটিয়ে দেবেন।

তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে গোটাতে শুরু করেন। একসময় ব্যবসাটাও ছেড়ে দিলেন। ঘরের আসবাবপত্র দিলেন বেচে। মেলামাইনের একখানি থালাও বাদ রাখেননি।

কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

: তাহলে আপনারা খানাপিনা করেন কীভাবে?

তিনি বললেন,

—কেন, স্টিলের বড় থালায়। পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে খাই।

সাহস-করে জানতে চাইলাম,

: চাচা, ব্যবসা ছেড়েছেন ভালো কথা। কিন্তু সংসার চলবে কী করে?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন,

: জমা টাকা আছে কিছু। ওগুলো দিয়ে চলে যাবে।

আমি বললাম,

—জমা টাকা শেষ হবার পর কী হবে?

তিনি উত্তর দিলেন,

: কেন, আল্লাহ খাওয়াবেন।

কিছু দিন পরের খবর, ভদ্রলোকের সংসারে খুব অশান্তি। ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ায় স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। তার মেয়ের জন্য একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। বাসার পরিস্থিতি দেখে আর ভদ্রলোকের 'দুনিয়া-বিমুখতা'র বয়ান শুনে, তারাও নিজেদের পথ মেপেছেন।

পাঠক, যুহদ তথা দুনিয়া-বিমুখতা নিয়ে আমাদের মাঝে এরকম ভুল ধারণার ছড়াছড়ি। মনে রাখবেন, দুনিয়া-বিমুখতা মানে কাজ-কর্ম সব ছেড়ে দিয়ে, মসজিদে বসে যাওয়া নয়। হঠাৎ ধন-সম্পদ সব বর্জন করাও নয়।

বরং সত্যিকারের যুহদ হলো, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া নিতান্তই তুচ্ছ—এটা ভেবে দুনিয়া বর্জন করা। আবার এই 'দুনিয়া বর্জন' মানে কাজ-কাম সব বন্ধ করে দিয়ে ঘরের চার-দেয়ালে নিজেকে আটকে ফেলা নয়। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব শিকায় তুলে বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোও নয়। আর খানাপিনা ছেড়ে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের নেককার মনীষীগণ দুনিয়া বর্জন-করা মানে বুঝতেন—হারাম থেকে বেঁচে থাকা। হ্যাঁ, হারাম থেকে বেঁচে থাকাই সত্যিকারের যুহদ।

মুযযাম্মিল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি একবার সুফ্ইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ'র বাড়ি গেলাম। তখন তিনি খেতে বসেছেন। তার প্লেটে ভুনা গোশত আর ডিম। ব্যাপার জানতে চাইলে তিনি বললেন,

'ভালো খাবার খেতে আমি কিন্তু তোমাদের বারণ করিনি। আমি বরং বলি, তোমরা আগে উত্তম জিনিস উপার্জন করো, এরপর খাও।'[১]

তার মানে, ভালো খাবার খেতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে শর্ত হলো, উপার্জনটা হালাল হতে হবে। আপনি শাক-পাতা দিয়ে খাবেন নাকি গোশত-ভুনা খাবেন, তা নিয়ে শরিয়তের মাথাব্যথা নেই। শরিয়ত দেখতে চায়, আপনার ওই শাক-পাতা বা গোশতটা এল কোথা থেকে।

একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো,

: আপনি আমাদেরকে দুনিয়া-বিমুখতা শেখান—অল্প জিনিস, অল্প খাবার আর অল্প পোশাকে অভ্যস্ত হতে বলেন, অথচ আপনি নিজেই সেই খোরাসান থেকে পণ্য কিনে আনেন মক্কায়, তারপর ব্যবসা করেন। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না?

---

[১] যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/২৭৭।

জবাবে ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন,

—শোনো তাহলে, আমি ব্যবসা করি যাতে মানুষের কাছে আমাকে হাত পাততে না হয়। অভাবের কারণে কারও সামনে নত হব, তা হতে পারে না। আমি আমার সম্মান টিকিয়ে রাখবার জন্যই জীবিকা তালাশ করি। সবচেয়ে বড় কথা, উপার্জনকে কাজে লাগিয়ে আমি আমার রবের ইবাদাত করতে পারি।[২]

সম্পদের প্রতি ভালোবাসা

সম্পদ থাকা এক জিনিস, আর সম্পদের প্রতি ভালোবাসা কিংবা আসক্তি থাকা আরেক জিনিস। ধন-সম্পদ থাকা মানেই আপনি দুনিয়া-মুখী, আর সম্পদ না থাকলেই আপনি দুনিয়া-বিমুখ—ব্যাপারটা মোটেও এতটা সরল নয়। সাহাবিদের কারও কারও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এখন, আপনি কি তাদেরকে দুনিয়াদার বলবেন? দুনিয়াদার তো দূরের কথা, তাদের মতো দুনিয়া-বিমুখ মানুষ জগতে আর আসবে না।

তফাতটা বুঝে নিন—আপনার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা-পয়সা আছে। কিন্তু ওগুলোর প্রতি আপনার কোনো মোহ নেই—হারাম পথে খরচ করেন না, অপচয় কিংবা কিপটেমি করেন না। মানুষের হক আদায় করেন, সাথে দান-সদাকার অভ্যেসও আছে। যাকাত আদায়ে কোনো গড়িমসি নেই। তখন অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আপনি দুনিয়া-বিমুখ মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন। 'আখিরাত-ওয়ালা' হবে আপনার পরিচয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন—মানুষের উচিত ধন-সম্পদের ব্যাপারে মনটা বড় রাখা। তাহলে বরকত আসবে। অর্থ-বিত্তকে হৃদয়ে জায়গা দেওয়া যাবে না।

---

[২] খতীব বাগদাদ, তারীখু বাগদাদ, ১০/১৬০।

উপার্জনের মাইন্ডসেট

একজন মুসলিমের সঙ্গে অমুসলিমের বড় ফারাকটা কোথায় জানেন? জীবিকা উপার্জনে। এটা সত্য, কাজের ধরনে হয়তো খুব একটা তর-তফাত নেই। তারা চাকরি করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, দোকান করে, কৃষিকাজ করে—আমরাও তা-ই করি। কিন্তু তার পরও একটা জায়গায় তাদের সাথে আমাদের বিস্তর অমিল। সেটা হলো—উপার্জনের মাইন্ডসেট।

একজন অ-মুসলিম তার ব্যবসার পেছনে সময় দেয়। কোনো মাসে হয়তো ভালো ইনকাম হয়। আর এই ইনকামের পেছনে সে ক্রেডিট দেয় তার শ্রম আর মেধাকে। এতে যেটা হয়—তার এই আয়ের পেছনে কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। 'কষ্ট করে উপার্জন করেছি, তাই ইচ্ছেমতো ভাঙব। তাতে কার কী আসে যায়?' এই টাকায় যে অন্য কারও হক আছে—তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না। এমনকি তার মা-বাবার পেছনেও সে খরচ করতে নারাজ।

এরপর যদি তার ব্যবসায় কখনো লোকসান হয়, তখন সে প্রচণ্ড ভেঙে পড়ে আর নিজেকে দুষতে থাকে। ভাবে, এখান থেকে হয়তো আর উতরে ওঠা সম্ভব হবে না। এই বিশাল ঋণের বোঝা খালাশ করে আবার কখনো কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়াবে—তার কাছে এ এক আকাশ-কুসুম কল্পনা। সে তখন হয় আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়,

নতুবা সংসার ছেড়েছুড়ে ফেরারি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। খুঁজলে আমাদের পাশের দেশ ভারতে এরকম হাজার হাজার সন্ন্যাসীর হদিস পাওয়া যাবে, যারা একসময়কার কোটিপতি। ব্যবসায় লস খেয়ে এখন সন্ন্যাস ধরেছে। একইভাবে, পত্রিকার পাতা ঘাঁটলে এরকম শত শত ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার খবরও নজরে পড়বে।

এবার আসি একজন মুসলিমের কথায়। একজন মুসলিমও তার ব্যবসার পেছনে সময় দেয়। কোনো কোনো মাসে তার ভালো আয় হয়। কিন্তু এই আয়ের ক্রেডিট সে নিজে নেয় না। পুরো ক্রেডিটটা দেয় আল্লাহকে। সে মন থেকে মানে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি তাঁর মালিকানা থেকে আমাদেরকে এক-আধটুকু দিয়েছেন দয়া করে। একসময় আবার তা ফিরিয়ে নেবেন।

হ্যাঁ, সে জানে তার শ্রম ও মেধার একটা ভূমিকা আছে ঠিক। কিন্তু কত পরিশ্রমী আর মেধাবীও তো এক দিনের ব্যবধানে ফতুর! আল্লাহ চাইলে তার নামটাও তো ফতুরদের কাতারে রাখতে পারতেন।

এরকম ভাবনার চমৎকার কিছু ফলাফল দাঁড়ায়। যেহেতু মানুষটা তার আয়-রুজির পেছনে পুরো ক্রেডিট আল্লাহকে দেয়, তাই খরচের বেলাতেও জবাবদিহিতার একটা প্রশ্ন চলে আসে। যে-সম্পদের মালিক আমি নই, তা ইচ্ছেমতো খরচ করা মোটেও শোভা পায় না। বরং আসল মালিক যিনি, তার কমান্ড মেনে চলাই উচিত। আর সেই কমান্ড হলো—আয়-রুজিতে গরিবকে ভাগ দিতে হবে, পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে হবে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পেছনে সম্পদ খাটাতে হবে।

আবার কখনো যদি লোকসানের মুখে পড়ে, তবে সেই মানুষটা হতাশ হয় না। বোকার মতো নিজেকে দোষারোপও করে না। সে জানে, ফলাফলটা তার হাতে নেই, সে বড়জোর পরিশ্রম করতে পারে। লাভ-লোকসান পুরোটাই আল্লাহর জিম্মায়। এতে যেটা হয়—সে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। দশ লাখ টাকা ঋণ হয়েছে তো কী! আল্লাহর

ভান্ডার অফুরন্ত। তিনি ঠিক সময়ে আমাকে ঋণ-মুক্ত করে দেবেন। এই অনুপ্রেরণাই তাকে নতুন করে পথ চলতে শেখায়। ঘর-সংসার ছেড়ে গিয়ে বনবাসী হয় না। আত্মহত্যার তো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রিয় ভাই-বোন, জীবিকা উপার্জনের এটা একটা বড় ফিলোসফি। এই একটা বুঝই আপনার আয়-রোজগারের পথকে সহজ করে দিতে পারে। ভালো করে মাথায় গেঁথে নিন—আপনার উপার্জনের পেছনে আপনার কোনোই অবদান নেই। ০.০০০০০১ শতাংশ ভূমিকাও না। পুরো ক্রেডিট একমাত্র আল্লাহর।

তাকওয়া আপনাকে পথ দেখাবে

মানুষ সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে কোন জিনিসটি নিয়ে বলুন তো? জীবিকা নিয়ে। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এই অভ্যেস মানুষের বহু পুরানো। কেবল ভাত-কাপড়ের কথা ভাবলে দোষ ছিল না। কিন্তু মানুষ আরও দু-ধাপ এগিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। ছেলেটা কেবল হয়তো হাঁটা শিখেছে, আর এখন থেকেই ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবার দৌড়-ঝাঁপ শুরু। যাকে বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। বাবা বললেন—'ছেলের তো একটা ভবিষ্যৎ করে যেতে হবে। মাথা গোঁজার একটা দেড়-তলা ঘর না হলে চলবে কী করে? জমি-জিরেতও কিছু লাগবে। তাহলে অন্তত গায়ে-গতরে খেটে সংসারটা করতে পারবে।'

মা-ও কম যান না। তিনি আরও তিন-সিঁড়ি ওপরে উঠে ভাবেন। মেয়েটার বয়স সবে ছয় কি সাত। এখন থেকেই ওকে নিয়ে ভাবা-ভাবি শুরু! মা বললেন—'তুমি শুধু ছেলের কথাই ভাবো। এদিকে মেয়েটাও যে বড় হচ্ছে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই! ওকে তো বিয়ে দিতে হবে একদিন। আজকাল পয়সা-কড়ি ছাড়া মেয়ে বিয়ে দেওয়া শক্ত। তুমি তো ওর বাপ। ওর একটা হিল্লে করে যাবে না? আল্লাহ না করুন দু-বছর বাদে যদি তুমি মারা যাও, তখন মেয়েটার উপায় হবে কী?'

বাবার মুখে এখন চিন্তার মেঘ। 'ঠিকই তো বলেছ। তাহলে এখন কী করতে বলো?'

মা এবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে উত্তর দেয়—'বেতন থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা রাখো ব্যাংকে। লাখ-খানেক জমলেই হবে। ওটাই দশ বছর পর বেড়ে-ছেড়ে পাঁচ লাখে দাঁড়াবে। ব্যস! মেয়ের ভবিষ্যৎ খাড়া। বিয়ে নিয়ে আর নো টেনশন!'

পাঠক, এটা কোনো কাল্পনিক সংলাপ নয়। বরং এমন কথা আপনারা নিতি-নিতিই শোনেন। তাদের কথা-বার্তা শুনলে মনে হয়, মানুষ বুঝি নিজেই নিজের রিয্‌কের ফায়সালা করে ফেলবে! এরকম বাড়তি ভাবনার কারণেই আমাদেরকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। আল্লাহ আমাদের ওপর রেগে যান—বান্দা, তোমার রিয্‌কের ফায়সালা তো আমি কত আগেই করে রেখেছি। আর সেটা নিয়ে তুমি কি-না ভেবে হয়রান হচ্ছ। যাও, তোমার শাস্তি এটাই—এখন থেকে জীবিকা নিয়ে ভেবে ভেবেই তুমি শেষ হবে।

অথচ আমরা যদি আল্লাহর ওপর সত্যিকারের ভরসা করতাম, তিনি আমাদের ভরপুর রিয্‌ক দিতেন। এমন এমন জায়গা থেকে জীবিকা আসত, যা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

যে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার রাস্তা করে দেবেন এবং তাকে এমন-সব দিক থেকে জীবিকা দেবেন, যা সে ধারণাও করতে পারবে না।[৭]

[৭] সূরা তালাক, ৬৫:২-৩।

লাগাম-টানা

আমাদের সমাজে উপার্জন মানে একটা রেইস বা প্রতিযোগিতা। উপার্জনের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মানুষগুলো যন্ত্রের মতো হয়ে যায়। রোজগারের উদ্দেশ্য এখানে জীবন ধারণ করা নয়, বরং টাকা-ধারণ করা।

আলাপটা বোঝার জন্য শুরুতেই আমরা রিয্ক বা জীবিকা শব্দটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব। জীবিকা বলতে আপনি আসলে কী বোঝেন? মানুষের জীবন-ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সবই তার জীবিকা। ইমাম বাগাবি রহিমাহুল্লাহ 'রিয্ক'-এর ব্যাখ্যায় লেখেন:

وَالرِّزْقُ اِسْمٌ لِّكُلِّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ حَتَّى الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ

> মানুষ যা যা থেকে উপকৃত হয়, তার সবগুলোকেই রিয্ক বলে। এমনকি সন্তান বা দাস-দাসীও রিয্কের অংশ।[১]

কেবল প্রচুর টাকা-পয়সা আর ধন-সম্পদকে জীবিকা বলে না। আপনার পরিবেশ, সমাজ, স্ত্রী-সন্তান, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ—এ সবই আপনার জীবিকা। কেননা এগুলো ছাড়া আপনি

---

[১] বাগাবি, তাফসীর, ১/৬৩।

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন না। কিন্তু পুঁজিবাদী ডাকাতগুলো আমাদের মাথায় একটা ধারণা পুশ করে দিলো—জীবিকা মানে শুধুই টাকা। ওদের কাছে উত্তম সন্তান কোনো জীবিকা নয়। এ কারণেই সন্তান নেবার ব্যাপারে ওরা আপনাকে কখনো উৎসাহ দেয় না। একটা সুন্দর সমাজকে ওরা জীবিকা মনে করে না। জীবিকার সমস্ত ধারণার কেন্দ্রে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে টাকা-কড়ি আর ধন-সম্পদকে।

এই জায়গাটায় ইসলাম আমাদেরকে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়। জীবিকার প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদেরকে সমান গুরুত্ব দিতে শেখায়, ভারসাম্য বজায় রাখতে বলে। আপনার আজকের দিনের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়ে গেছে? এবার তাহলে পরিবারের পেছনে সময় দিন । সমাজটা কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়, সেদিকে মন দিন। মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ আর মন্দ কাজে বাধা দিন। কেননা, এই সবগুলো আপনার জীবিকার অংশ।

তাহলে মনে রাখতে হবে, জীবিকা উপার্জনের বেলায় ব্যালেন্স করে চলা খুবই জরুরি। শুধুই টাকা রোজগারের দিকে ঝুঁকে পড়া যাবে না।

এবার চলুন জীবিকার ব্যাপারটাকে আরও একটু বিস্তৃত জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করি। দুনিয়াই কিন্তু আমাদের শেষ নয়। পরকাল আছে। আর পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। তাই জীবিকা উপার্জনের বেলায় শুধু দুনিয়ার কথা ভাবলে চলবে না। আপনাকে একইসঙ্গে পরকালের জীবিকার কথাও ভাবতে হবে। দুনিয়ার জীবনে জীবিকা একটু কম হলেও চলে যাবে একরকম। কিন্তু পরকালের অসীম জগতে যদি আপনি জীবিকা থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে সেটা হবে সাংঘাতিক ক্ষতি—যা কোনোকিছুর বিনিময়ে পূরণ করা যাবে না। তাই দুনিয়াতে বসেই পরকালের জীবিকার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

এ কারণে আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততার একটা অংশ পরকাল

হালাল-হারাম

মানুষ হরদম মিথ্যা বলছে। খাবারে অনবরত ভেজাল মেশাচ্ছে। দিনে-দুপুরে লোক ঠকাচ্ছে। এভাবে হারামের পথে তারা কখন পা বাড়ায় জানেন? যখন ধরেই নেয় রোজগারটা গায়ের জোরেই করতে হবে। সে যেহেতু ভাবে জীবিকার চাবিটা তার হাতেই—চেষ্টা-তদবিরেই ফল মিলবে—তাই সব রকম উপায়ে আয়টা বাড়িয়ে নেবার ধান্দা করে। হারামের পথে পা বাড়াতে দু-দণ্ড ভাবে না।

কিন্তু সে যদি মানত, আয়-রোজগারের পেছনে মানুষের হাত নেই। তোড়-জোড় করে কোনো ফায়দা হবে না। চাবিটা আল্লাহর হাতে। তাহলে সে হারামে পা বাড়াত না। আল্লাহর ভান্ডারে-থাকা-জিনিস তো হারাম পথে হাসিল হবে না! তাঁকে সন্তুষ্ট করেই অর্জন করতে হবে।

জাস্ট এই চিন্তাটাই আপনার ইনকামের গতিপথ বদলে দিতে পারে।

অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—হারাম উপার্জন করে জীবনে উন্নতি করেছে, এমন নজির একটাও পাবেন না। হ্যাঁ, সাদা-চোখে মনে হবে ভালোই তো আছে। গাড়ি-বাড়ি, জোত-জমি কী নেই! কিন্তু একটু খোঁজ-খবর করলেই জানতে পাবেন, ভেতরে ভেতরে কতখানি অশান্তি।

এক পড়শির কথা বলি। শুধুই পড়শি বললে হয়তো কম বলা হয়,

আমাদের একেবারে পাশের বাড়ি। লোকটা আর্মিতে চাকরি করত। মিশনে দুয়েকবার বিদেশও ঘুরেছে—মাল-পানি কামিয়েছে মেলা। তো, চাকরির মেয়াদ যখন ফুরোল, তখন তল্পিতল্পা নিয়ে গ্রামে এসে ডেরা বাঁধল। সরকারি চাকুরেরা যেটা করে আরকি। সারাজীবন সরকারের ফুট-ফরমাশ খেটে শেষ জীবনে গ্রামে জায়গা পাতে। শখের বশে টুকটাক নামাজ পড়ে। অস্বীকার করব না, এভাবে আগের জীবনের পাপ-তাপ মোছার একটু হলেও চেষ্টা করে।

কিন্তু আমার সেই পড়শি পুরোই উলটো ধাতের জিনিস। হাড়ে হাড়ে বদমাইশ। পরের জমির আইল ঠেলতে ঠেলতে শেষমেশ আস্ত জমিটাই গিলে বসে। প্রথমে নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে ভুয়া দলিল বানায়। এরপর জমির আসল মালিকের বিরুদ্ধেই মামলা ঠুকে দেয়! আপনারাই বলুন, এটা কত বড় জুলুম? এভাবে যে কত মানুষের জমি সে দখল করেছে, তার ইয়ত্তা নেই! এখনো সেই কারবারই করছে। লোকটার জ্বালাতনে গ্রামের লোকজন অতিষ্ঠ। আমরাও পারিবারিকভাবে তার উৎপাতের শিকার।

খুব কষ্ট নিয়েই গ্রামবাসী বলে—আল্লাহ, এই অমানুষটার চাকরির মেয়াদ কেন ফুরোল! কেন ও গ্রামে ফিরে এল!

এই যে হারাম পথে আয়-রোজগার করছে লোকটা, এর পরিণতি কী হয়েছে শুনবেন? দুই ছেলে আর এক মেয়ে তার। মেয়েটা দেশের নামজাদা এক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আইন বিভাগে পড়ত। বছর পাঁচেক আগে হুট করে একদিন শোনা গেল তার মাথায় গন্ডগোল। রাত-বিরেতে বাসার বাইরে বেরিয়ে যায়। গতরে কাপড় রাখে না। আর বাবা-মা'কে কীসব অশ্লীল গালাগাল দেয়। পাগলামি না-ছোটায় বিয়েও দিতে পারেনি। অথচ বয়স কিন্তু পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কোঠায়!

দুই ছেলের বড়টা সুদি-ব্যাংকে চাকরি করে। বয়স চল্লিশের কম হবে না—কিন্তু বিয়ে-থা করেনি। লোকে বলে, ওটারও মাথায় ছিট

আছে, নেশাগ্রস্ত—মদ-টদ খায়। আর ছোট ছেলেটা একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ করেছে। এটারও ওই একই দশা—পুরোপুরি বখে গেছে। ঘোরতর নাস্তিক বললেও কম বলা হবে। কথা-বার্তা শুনলে গা গুলিয়ে আসে। শাহবাগী-ব্লগারদের সঙ্গে ওঠবস আছে। নিজেও নাকি ব্লগ-ট্লগ লেখে।

বছর তিন-চারেক আগের কথা। ছোট ছেলেটা এসেছে বাড়িতে। ভালো কথা। এখন গ্রামে এলে তো আপনাকে সমাজের কায়দা-কানুন মেনে চলতে হবে, তাই না? গ্রামে এলে তা মেনে চলাটাই হলো কমন সেন্স। তো, আস্তা-গোঁয়ারের মতো ওই ছেলে করতে লাগল উলটো কাজ। সারাদিন হাফ-প্যান্ট পরে এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করে। কানে ওয়্যারলেস হেডফোন গোঁজা—পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রাণীটা মানুষ না গরু-ছাগল সেই হুঁশ পর্যন্ত নেই। মুরুব্বিদের দেখলে সালাম-কালাম তো দূরের কথা, কেমন একটা ভাব ধরে জমিদারের মতো হেঁটে যায়।

তবে সবচেয়ে খতরনাক ব্যাপার হলো, গ্রামে এসেও উলটা-পালটা কথা-বার্তা পুরোদমে জারি রেখেছে। পরে কয়েকজন মুরুব্বি যখন কৈফিয়ত চাইলেন—এরকমভাবে চলা-চলতির কারণ কী—তখন ওই ছেলে মুরুব্বিদের যাচ্ছেতাই গালাগালি করল। তাও সে যেন-তেন গালি নয়, খাস ইংরেজি গালি। আপনারাই বলুন, গ্রামের লোকজনের আর মাথা ঠিক থাকে তখন? কয়েকজন মিলে ঘাড় উঁচিয়ে ধরে নিয়ে গেল বাজারে। অনেকটা জ্যান্ত-হাঁস যেভাবে গলা উঁচু করে ধরে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হলো গণধোলাই। কিল-ঘুষি একটাও মাটিতে পড়ে নাই! এর পর থেকে তিন ছেলে-মেয়ের কাউকেই আর গ্রামে খুব একটা দেখা যায় না।

প্রিয় পাঠক, একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কি, আল্লাহ কিন্তু শাস্তিটা দিলেন ভিন্ন উপায়ে। লোকটা হারাম পথ ধরেছে বলে আয়-রোজগার কমিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং উপার্জন তো দিন দিন বেড়েছে।

কোটিপতি

এ-দেশে বড় বড় ধনীদের যদি একটা তালিকা হয়, তাতে ভালো মানুষ ক'জন পাওয়া যাবে বলুন! একজনও পাবেন কি-না সন্দেহ। সবগুলোই এক-একটা 'দরবেশ-বাবা'। এই দরবেশ-বাবাদের হাতে পুরো দেশটাই জিম্মি!

আচ্ছা কখনো কি এ ব্যাপারটা নিয়ে আক্ষেপ হয়েছে আপনার—বড় বড় ধনীর তালিকায় একজনও ভালো মানুষ নেই কেন? এই তালিকায় বেশিরভাগই যদি দ্বীনদার মানুষ থাকত, তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হতো। দিকে দিকে এমন হাহাকার দেখতে হতো না। দ্বীনদার ধনী মানুষগুলোর যাকাতের পয়সাতেই, গরিবের আয়-রোজগারের বিলি-ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা—এ-দেশে যে যত বড় জোচ্চোর, তার ধন-সম্পদ তত বেশি। চোর-বাটপারগুলোই আঙুল-ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ খারাপ মানুষদের হাতে সম্পদ তুলে দিতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمْ

নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ তুলে দিয়ো না।[১]

আল্লাহর-দেওয়া সম্পদ আল্লাহ-ওয়ালা মানুষদের হাতে থাকুক—এমনটাই চাইতেন আমাদের প্রিয় নবিজি। তিনি বলেন,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

ভালো সম্পদ ভালো মানুষগুলোর হাতে। ব্যাপারটা কতই-না চমৎকার![২]

আমার-আপনার গ্রামে ধন-সম্পদে এগিয়ে-থাকা দশজন মানুষের নাম নিলে দেখা যাবে—তালিকায় দুজন হলো ছিঁচকে রাজনীতিবিদ, দুজন করে অবৈধ-বালুর ব্যবসা, তিন-জন খেলে জুয়া, বাকি তিন-জনের আদম-ব্যবসা। অথচ মদীনার সেরা ধনীদের তালিকায় কারা ছিলেন, তা জানেন তো? উসমান ইবনু আফফান, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, আবু বকর সিদ্দীক ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের মতো সেরা সেরা সাহাবি। এখন আপনিই বলুন, সুখী বেশি হবার কথা কাদের? সে-কালের মদীনাবাসীর, নাকি আপনার-আমার গ্রামবাসীর? সুখী হওয়া দূরে থাক, ধনীদের উৎপাতে গাঁয়ের মানুষের তো দম-ফাটে অবস্থা!

ঠিক এ কারণেই ভালো মানুষগুলোকে হতে হবে কোটিপতি। আল্লাহর-দেওয়া ধন-সম্পদ খারাপ লোকদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। জোর করে নয়, হালাল ব্যবসার মাধ্যমে।

পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো ভাববেন—'ইসলাম তো আমাদেরকে ছিমছাম-ভাবে জীবন কাটাতে উৎসাহ দেয়, কোটিপতি হতে বলে না। তা ছাড়া আগের জামানার নেককার-মনীষীদেরও তো কোটিপতি হবার বাসনা ছিল না। তাহলে কেন আমাকে কোটিপতি হতে বলছেন?'

---

[১] সূরা নিসা, ৪ : ৫।

[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২৯৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭৭৭৬৩।